অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি

লেখক: অধ্যাপক ড. কাজী আ. মান্নান | প্রকাশিত: 26 July 2026, 01:42 AM | বিভাগ: উদ্যোক্তা উন্নয়ন

বর্তমান বিশ্বে উচ্চশিক্ষার মান নির্ধারণে গবেষণা একটি মৌলিক সূচকে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল জ্ঞান বিতরণের প্রতিষ্ঠান নয়; বরং নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, উদ্ভাবন এবং বৈশ্বিক জ্ঞানভা-ারে অবদান রাখার কেন্দ্র হিসেবেও বিবেচিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংগুলো গবেষণার গুণগত মান ও প্রভাব মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করে থাকে। এর মধ্যে কিউএস (কোয়াকুরেলি সিমন্ডস)-এর বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিউএস র‍্যাংকিংয়ে গবেষণার প্রভাব পরিমাপের জন্য যে সূচকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তা হলো "অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি" (সাইটেশনস পার ফ্যাকাল্টি)।

একটি গবেষণা প্রবন্ধ কতবার অন্য গবেষক দ্বারা উদ্ধৃত হয়েছে, তা সাধারণত সেই গবেষণার প্রভাব,

গ্রহণযোগ্যতা এবং একাডেমিক গুরুত্বের নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়। আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট উদ্ধৃতির সংখ্যা যখন তার শিক্ষক বা অনুষদ সদস্যের সংখ্যার সাথে তুলনা করে হিসাব করা হয়, তখন যে সূচকটি পাওয়া যায় তাকে অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি বা সাইটেশনস পার ফ্যাকাল্টি বলা হয়। এটি মূলত গবেষণার পরিমাণ নয়, বরং গবেষণার গুণগত মান, প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার প্রতিফলন।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় গত এক দশকে গবেষণা প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আন্তর্জাতিক মানের উদ্ধৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে এখনও উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হলেও সেই গবেষণার বৈশ্বিক প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। ফলে কিউএস র‍্যাংকিংয়ের এই গুরুত্বপূর্ণ সূচকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনও পিছিয়ে রয়েছে। কিউএস বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি গবেষণা প্রভাব পরিমাপের অন্যতম প্রধান সূচক। সাধারণভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও শিক্ষকদের প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ কতবার অন্যান্য গবেষক দ্বারা উদ্ধৃত হয়েছে, তার ভিত্তিতে এই সূচক নির্ধারণ করা হয়। তবে কিউএস কেবল মোট উদ্ধৃতির সংখ্যা বিবেচনা করে না; বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট অনুষদ সদস্যের সংখ্যার সাথে উদ্ধৃতির পরিমাণের একটি অনুপাত নির্ধারণ করে। ফলে বড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তুলনামূলক ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়।

উদ্ধৃতি মূলত এক ধরনের একাডেমিক স্বীকৃতি। যখন একজন গবেষক অন্য গবেষকের কাজ ব্যবহার করেন বা তাঁর গবেষণাকে তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করেন, তখন সেটি একটি উদ্ধৃতি হিসেবে গণ্য হয়। একটি গবেষণা যত বেশি উদ্ধৃত হয়, তত বেশি বোঝা যায় যে সেটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এজন্যই গবেষণা জগতে উদ্ধৃতিকে গবেষণার প্রভাব-এর অন্যতম নির্ভরযোগ্য সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলোজি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, এবং ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড উচ্চ “অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি” (সাইটেশনস পার ফ্যাকাল্টি) অর্জনের মাধ্যমে গবেষণার ক্ষেত্রে তাদের বৈশ্বিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছে। এসব প্রতিষ্ঠানে শুধু অধিক সংখ্যক গবেষণা প্রকাশিত হয় না; বরং গবেষণাগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ও উদ্ধৃত হয়। কিউএস-এর দৃষ্টিতে অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার গুণগত মান, আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতা, একাডেমিক প্রভাব এবং জ্ঞান উৎপাদনের সক্ষমতার প্রতিফলন। একটি বিশ্ববিদ্যালয় যদি উচ্চমানের গবেষণা প্রকাশ করতে পারে এবং সেই গবেষণা বৈশ্বিক গবেষণা সমাজে প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে তার অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচক উন্নত হয়। ফলে এই সূচক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সক্ষমতা মূল্যায়নের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা খাতে গবেষণা কার্যক্রম গত এক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কিছু শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা প্রকাশের ক্ষেত্রে আগের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় হয়েছে। তবুও অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচকে বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থান এখনও সন্তোষজনক নয়।

বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পরিমাণের তুলনায় গবেষণার আন্তর্জাতিক প্রভাব সীমিত। অনেক গবেষণা স্থানীয় বা আঞ্চলিক সমস্যার ওপর ভিত্তি করে হলেও তা আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্প্রদায়ের কাছে পর্যাপ্তভাবে পৌঁছাতে পারে না। ফলে প্রকাশনা থাকলেও উদ্ধৃতির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। গবেষণার মান, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, প্রকাশনার জার্নাল নির্বাচন এবং গবেষণার দৃশ্যমানতা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিছু শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা প্রকাশনায় তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকলেও অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা এখনও পাঠদানকেন্দ্রিক একাডেমিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনেক

শিক্ষককে অতিরিক্ত ক্লাস ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হওয়ায় গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না।

একইসাথে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা অবকাঠামো, গবেষণা অনুদান, উন্নত গবেষণাগার এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচককে প্রভাবিত করছে। ফলে গবেষণা প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও উদ্ধৃতির হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছাতে পারছে না। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার পেছনে একাধিক কাঠামোগত, আর্থিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো গবেষণা অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা। উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা পরিচালনা, তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা সহকারী

নিয়োগ, ল্যাবরেটরি উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক প্রকাশনার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা তহবিল সীমিত হওয়ায় গবেষকদের অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সীমিত সম্পদের ওপর নির্ভর করতে হয়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো উচ্চমানের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনার ব্যয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অনেক কিউ ১, কিউ ২, কিউ ৩ এবং কিউ ৪ সূচকিত ওপেন-অ্যাক্সেস জার্নালে (বিশেষত স্কোপাস বা ওয়েব অব সাইন্স-এ অন্তর্ভুক্ত) প্রকাশনার জন্য আর্টিকেল প্রসেসিং চার্জ (এপিসি) বা প্রকাশনা ফি প্রদান করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই ফি ১ হাজার থেকে ৫

হাজার মার্কিন ডলার বা তারও বেশি হতে পারে। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষক, গবেষক বা স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পক্ষে এ ধরনের ব্যয় বহন করা অত্যন্ত কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রকল্প থেকে পর্যাপ্ত অর্থায়ন না থাকলে অনেকে মানসম্পন্ন গবেষণা আন্তর্জাতিকভাবে দৃশ্যমান জার্নালে প্রকাশের সুযোগ হারায়। ফলস্বরূপ গবেষণাগুলো কম প্রচার পায় এবং উদ্ধৃতির সম্ভাবনাও হ্রাস পায়।

এছাড়া আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতার সীমাবদ্ধতা, উন্নত গবেষণাগারের অভাব, গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সময়ের সংকট এবং অতিরিক্ত পাঠদান ও প্রশাসনিক দায়িত্বও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা। অনেক শিক্ষককে সপ্তাহে একাধিক কোর্স পরিচালনার পাশাপাশি প্রশাসনিক কাজও করতে হয়, ফলে দীর্ঘমেয়াদি ও উচ্চপ্রভাবসম্পন্ন গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সময় অবশিষ্ট থাকে না।

অন্যদিকে গবেষণার মান, গবেষণা বিষয় নির্বাচন এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বর্তমান বৈশ্বিক গবেষণা পরিবেশে শুধু গবেষণা প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়; গবেষণাকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হয় যাতে তা আন্তর্জাতিক গবেষক সমাজের কাছে প্রাসঙ্গিক ও ব্যবহারযোগ্য হয়। এই সক্ষমতার ঘাটতিও বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচককে প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত করছে।

অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি কম হওয়া শুধু একটি র‍্যাংকিং সমস্যা নয়; বরং এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক গবেষণা সক্ষমতার ওপরও প্রভাব ফেলে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। কিউএস র‍্যাংকিংয়ে অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হওয়ায় এই ক্ষেত্রে দুর্বলতা সামগ্রিক অবস্থানকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতার সুযোগ কমে যায়। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত উচ্চপ্রভাবসম্পন্ন গবেষকদের সাথে কাজ করতে আগ্রহী হয়। উদ্ধৃতি কম হলে সেই সুযোগ সীমিত হয়। তৃতীয়ত, গবেষণা অনুদান ও অর্থায়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই গবেষণার পূর্ববর্তী প্রভাব বিবেচনা করে অর্থায়ন প্রদান করে। চতুর্থত, শিক্ষার্থীদের গবেষণা দক্ষতা উন্নয়নেও এর প্রভাব পড়ে। গবেষণামুখী পরিবেশ দুর্বল হলে শিক্ষার্থীরাও আন্তর্জাতিক মানের গবেষণায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ কম পায়।

বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণার প্রভাব বৃদ্ধিকে একটি কৌশলগত অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে। তারা গবেষণা অর্থায়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, গবেষণা সহায়ক অবকাঠামো এবং গবেষকদের জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করে। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর, নানইয়াং টেকনোলোজিক্যাল ইউনিভার্সিটি এবং চীনের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণার মান ও উদ্ধৃতি বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি করছে। তাদের অভিজ্ঞতা দেখায় যে গবেষণার সংখ্যা নয়, বরং গবেষণার গুণগত মান, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বৈশ্বিক দৃশ্যমানতাই উদ্ধৃতি

বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। বাংলাদেশের জন্যও এই শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচক উন্নয়নের জন্য বিচ্ছিন্ন বা স্বল্পমেয়াদি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়; বরং একটি সমন্বিত, গবেষণাকেন্দ্রিক এবং দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় কৌশল গ্রহণ প্রয়োজন। বর্তমান বৈশ্বিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণার প্রভাব, আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতা এবং উদ্ধৃতির হার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মর্যাদা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে গবেষণা প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি গবেষণার গুণগত মান এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করাও সমানভাবে জরুরি। এক্ষেত্রে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন গবেষণা জার্নালের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও নিজস্ব আন্তর্জাতিক মানের জার্নালের সংখ্যা সীমিত, এবং বিদ্যমান অনেক জার্নাল আন্তর্জাতিক ডাটাবেজে সূচিকৃত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ধীরে ধীরে এমন জার্নাল প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করতে হবে, যা স্কোপাস, ওয়েব অব সাইন্স, ডিওএজে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সূচকে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করবে। একটি শক্তিশালী ও আন্তর্জাতিকভাবে দৃশ্যমান বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল ব্যবস্থা গবেষকদের মানসম্পন্ন গবেষণা প্রকাশে উৎসাহিত করবে এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ বৃদ্ধি করবে।

দ্বিতীয়ত, কিউ ১, কিউ ২, কিউ ৩ এবং কিউ ৪ সূচিকৃত আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা প্রকাশের জন্য একটি জাতীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক স্কলারশিপ ব্যবস্থা চালু করা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে অনেক উচ্চমানের ওপেন-অ্যাক্সেস জার্নালে প্রকাশনার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্টিকেল প্রসেসিং চার্জ প্রদান করতে হয়, যা বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষক, গবেষক এবং গবেষণার্থী শিক্ষার্থীর জন্য বহন করা কঠিন। ফলে অনেক মানসম্পন্ন গবেষণা আন্তর্জাতিকভাবে দৃশ্যমান জার্নালে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ হারায়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যৌথভাবে “পাবলিকেশন স্কলারশিপ ফান্ড” বা “রিসার্চ পাবলিকেশন গ্র্যান্ট” চালু করতে পারে, যার মাধ্যমে কিউ ১- কিউ ৪ জার্নালে প্রকাশনার ফি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বহন করা হবে। বিশেষ করে তরুণ শিক্ষক, পিএইচডি গবেষক এবং ¯œাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের সহায়তা গবেষণা উৎপাদন ও উদ্ধৃতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতা সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বৈশ্বিকভাবে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক যৌথ গবেষণা সাধারণত বেশি উদ্ধৃত হয় এবং দ্রুত গবেষণা দৃশ্যমানতা অর্জন করে। তাই বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা কেন্দ্র এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্কের সাথে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একইসাথে শিক্ষক ও গবেষকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন, কর্মশালা এবং গবেষণা বিনিময় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়াতে হবে।

চতুর্থত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা মূল্যায়নের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনা দরকার। শুধু পদোন্নতি

বা প্রশাসনিক প্রয়োজনের জন্য গবেষণা প্রকাশ নয়, বরং উচ্চপ্রভাবসম্পন্ন গবেষণা উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে হবে। কিউ ১ এবং কিউ ২ জার্নালে প্রকাশনার জন্য বিশেষ প্রণোদনা, গবেষণা পুরস্কার এবং অতিরিক্ত গবেষণা অনুদান প্রদান করা যেতে পারে। পাশাপাশি গবেষকদের জন্য গবেষণা পদ্ধতি, একাডেমিক লেখালেখি, গবেষণা তথ্য বিশ্লেষণ এবং আন্তর্জাতিক প্রকাশনা কৌশল বিষয়ক নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি, অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশকে “প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি” থেকে “প্রভাবশালী গবেষণা বৃদ্ধি”-এর দিকে অগ্রসর হতে হবে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল প্রতিষ্ঠা, কিউ ১- কিউ ৪ প্রকাশনা স্কলারশিপ চালু, গবেষণা অর্থায়ন বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক গবেষণা সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভবিষ্যতে কিউএস সূচকের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণার ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের উচিত পূর্ণকালীন গবেষণামুখী শিক্ষক নিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট তহবিল গঠন করা। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ গবেষণা ও শিক্ষক বিনিময় কর্মসূচি গবেষণার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। শুধুমাত্র পাঠদাননির্ভর মডেল থেকে বেরিয়ে এসে গবেষণাকেন্দ্রিক একাডেমিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার সম্ভাবনা বেশি থাকলেও শিক্ষক সংকট, প্রশাসনিক চাপ এবং সীমিত গবেষণা অর্থায়ন বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান। অনেক শিক্ষককে একইসাথে পাঠদান, প্রশাসন এবং গবেষণা পরিচালনা করতে হয়। ফলে গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। গবেষণার মান উন্নয়নের জন্য গবেষণা সহায়ক অবকাঠামো, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং গবেষণা অনুদান বৃদ্ধি অপরিহার্য। একইসাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব কমিয়ে গবেষণায় অধিক মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ তৈরি করতে হবে।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা খাতে গবেষণার ভিত্তি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে। তরুণ গবেষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক প্রকাশনা বৃদ্ধি এবং গবেষণার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যতে অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচকে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। যদি গবেষণা বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়নে ধারাবাহিক পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে আরও ভালো অবস্থান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

কিউএস র‍্যাংকিংয়ের অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচক মূলত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার প্রকৃত প্রভাব, আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা এবং বৈশ্বিক জ্ঞানভাণ্ডারে অবদানের মাত্রা পরিমাপ করে। বাংলাদেশের

উচ্চশিক্ষা খাত গত এক দশকে গবেষণা প্রকাশনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চ উদ্ধৃতিপ্রাপ্ত গবেষণা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখনও কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌঁছাতে পারেনি। এই বাস্তবতায় শুধুমাত্র গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই যথেষ্ট নয়; বরং এমন গবেষণা উৎপাদন করতে হবে যা আন্তর্জাতিক গবেষক সমাজে ব্যবহৃত, আলোচিত এবং উদ্ধৃত হবে। এই প্রেক্ষাপটে একটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন-উচ্চমানের গবেষণা প্রকাশের অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা। বর্তমানে কিউ ১, কিউ ২, কিউ ৩ এবং কিউ ৪ সূচিকৃত আন্তর্জাতিক ওপেন-অ্যাক্সেস জার্নালগুলোতে প্রকাশনার জন্য যে পরিমাণ আর্টিকেল প্রসেসিং চার্জ প্রদান করতে হয়, তা বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষক, গবেষক এবং গবেষণার্থী শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সামর্থ্যের বাইরে। অনেক ক্ষেত্রে একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যয় একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের কয়েক মাসের বেতনের সমতুল্য হতে পারে। ফলে বহু মানসম্পন্ন গবেষণা আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, যা শেষে পর্যন্ত দেশের অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচকেও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। তাই গবেষণা প্রকাশনা ব্যয়কে ব্যক্তিগত দায় হিসেবে না দেখে প্রাতিষ্ঠানিক ও জাতীয় বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। একইসাথে বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জার্নাল প্রকাশনার সক্ষমতা গড়ে তোলা। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা পরিচালনা করলেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, নিয়মিত প্রকাশিত এবং স্কোপাস বা ওয়েব অব সাইন্স-এ সূচিকৃত নিজস্ব জার্নালের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। অথচ বিশ্বের গবেষণানির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজস্ব শক্তিশালী জার্নাল ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈশ্বিক গবেষণা নেটওয়ার্কে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করছে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি ধাপে ধাপে আন্তর্জাতিক সম্পাদকম-লী, কঠোর পিয়ার-রিভিউ ব্যবস্থা, ডিজিটাল প্রকাশনা অবকাঠামো এবং আন্তর্জাতিক সূচিকরণ অর্জন করতে পারে, তাহলে দেশীয় গবেষণার বৈশ্বিক দৃশ্যমানতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে কিউ ১- কিউ ৪ জার্নালে প্রকাশনার জন্য একটি স্থায়ী “পাবলিকেশন স্কলারশিপ” বা “ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল পাবলিকেশন ফান্ড” গঠন সময়ের দাবি। যেমন মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি দেওয়া হয়, তেমনি গবেষণা প্রকাশনাকেও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গবেষণা ফাউন্ডেশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যৌথ অর্থায়নে যদি প্রকাশনা সহায়তা তহবিল গঠন করা যায়, তাহলে হাজারো তরুণ গবেষক আন্তর্জাতিক প্রকাশনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। এর দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল হবে গবেষণার মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং উদ্ধৃতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। সর্বোপরি, বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে গবেষণাকে কতটা কৌশলগতভাবে জাতীয় উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তার ওপর। গবেষণা প্রকাশনা ব্যয়ে স্কলারশিপ, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল বৃদ্ধি, গবেষণা অর্থায়ন

সম্প্রসারণ এবং বৈশ্বিক গবেষণা সহযোগিতা জোরদার করার মাধ্যমে বাংলাদেশ কেবল কিউএস র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি করবে না; বরং একটি জ্ঞাননির্ভর, উদ্ভাবনমুখী এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতাশীল উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচকের উন্নয়ন তাই কোনো একক র‍্যাংকিং লক্ষ্য নয়; এটি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাকে বৈশ্বিক মানে উন্নীত করার একটি অপরিহার্য পথনকশা।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।